তৃতীয় অধ্যায়

চরিত্রের শিক্ষা

প্রথম বৎসর

পূর্বে শিশুর জীবনের প্রথম বৎসরকে শিক্ষার আওতার বাহিরে ধরা হইত। যতদিন শিশু কথা বলিতে না শেখে ততদিন ইহাকে জননীর বা ধাত্রীর সম্পূর্ণ তত্ত্বাবধানে রাখা হইত; মনে করা হইত শিশুর পক্ষে কি মঙ্গলজনক তাহা ইঁহারা নিজেদের প্রবৃত্তি হইতেই জানেন। প্রকৃতপক্ষে ইঁহারা কিছুই জানিতেন না। জীবনের প্রথম বৎসরেই বহু শিশু মারা যাইত; যাহারা বাঁচিয়া থাকিত তাহাদের মধ্যেও অনেকে স্বাস্থ্যহীন হইয়া উঠিত; লালন-পালনের দোষে বহু খারাপ অভ্যাস গঠিত হইত। সম্প্রতি এ সকল বিষয় জানা গিয়াছে। শিশু-পালনাগারে যদি বিজ্ঞান প্রবেশ করে তবে অনেকে রুষ্ট হন। কেননা তাঁহাদের ধারণা শিশুর মঙ্গলের সম্পূর্ণ ভার মায়ের হাতে; শিশুর জীবনে মায়ের কথঞ্চিৎ স্থান যে বিজ্ঞান গ্রহণ করিবে তাহা তাঁহারা বরদাস্ত করিতে চান না। কিন্তু ভাবপ্রবণতা এবং বাৎসল্যপ্রীতি এক সঙ্গে থাকিতে পারে না। যে জনক বা জননী নিজ সন্তানকে ভালবাসেন তিনি চান যে তাঁহার সন্তান বাঁচিয়া থাকুক, দরকার হইলে এজন্য বুদ্ধি প্রয়োগ করিতেও তিনি কুণ্ঠিত নন। কাজেই নিঃসন্তান লোকের মধ্যে এবং রুশোর মত যাঁহারা নিজেদের সন্তান-দিগকে অনাথ আশ্রমে প্রতিপালনের পক্ষপাতী তাহাদের মধ্যেই এই ভাবপ্রবণতা প্রবল হইতে দেখা যায়। শিশুর পালন ব্যাপারে বিজ্ঞান কি বলে বেশীরভাগ শিক্ষিত জনক জননী তাহা জানিতে ইচ্ছুক; অশিক্ষিত পিতামাতাও শিশু-মঙ্গল কেন্দ্র হইতে ইহা জানিয়া লয়। ইহাতে যে সুফল ফলিয়াছে তাহা শিশু মৃত্যুর সংখ্যা যথেষ্ট হ্রাস পাওয়া হইতেই বোঝা যায়। ইহা বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ আছে যে, যথোপযুক্ত যত্ন ও নিপুণতা প্রয়োগ করিলে অতি অল্প শিশুই আঁতুরে মারা যাইবে। কেবল খুব অল্পই যে মরিবে তাহা নহে, যাহারা বাঁচিয়া থাকিবে তাহারা দেহে এবং মনে অধিকতর স্বাস্থ্যের অধিকারী হইবে।

শিশুর দৈহিক স্বাস্থ্যের প্রশ্ন (সমস্যা) এ পুস্তকের আলোচ্য নয়; ইহা চিকিৎসকদের হাতেই ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। যেখানে ইহা মনোবিজ্ঞানের সহিত জড়িত সেখানেই কেবল ইহার উল্লেখ করিব। কিন্তু জীবনের প্রথম বছরে কোন্‌টি মানসিক, কোন্‌টি দৈহিক সমস্যা তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব।

অধিকন্তু শিশুর দেহের দিকে কোন লক্ষ্য না রাখিলে—কয়েক বছর পরে শিশুর দৈহিক সমস্যা শিক্ষকের প্রধান প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইবে। অতএব অনধিকার প্রবেশ হইলেও মধ্যে মধ্যে আমাদিগকে শিশুর দৈহিক প্রশ্ন লইয়াও আলোচনা করিতে হইবে।

সদ্যঃপ্রসূত শিশু কতকগুলি প্রতিবর্তী (reflexes) স্বভাব এবং প্রবৃত্তি লইয়া ভূমিষ্ঠ হয়; প্রথমে ইহার অভ্যাস বলিয়া কিছু থাকে না। মাতৃগর্ভে থাকিবার সময় সে যাহা অভ্যাস করিয়াছিল তাহা নূতন পরিবেশে কোনই কাজে আসে না। এমনকি শ্বাস প্রশ্বাস নেওয়াও অনেক সময় শিখাইতে হয় এবং কতক শিশু এই অভ্যাস তাড়াতাড়ি শিখিতে পারে না বলিয়াই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। শিশুর ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় একটি প্রবৃত্তি বেশ পুষ্ট (developed) দেখা যায়; ইহা হইল চুষিবার প্রবৃত্তি। শিশু যখন কিছু চুষিতে শুরু করে তখন এই নূতন পরিবেশেও অস্বস্তি বোধ করে না। কিন্তু জাগ্রত অবস্থার অন্য সময়টুকু তাহার কাছে ফাঁকা, বিস্ময়কর মনে হয়, চব্বিশ ঘণ্টার অধিকাংশ সময় ঘুমাইয়া কাটাইয়া সে এই অস্বস্তিকর অবস্থায় আরামবোধ করে। এক পক্ষ পরে কিন্তু এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। এই সময়ের মধ্যে নিয়মিত-ভাবে বারবার অভিজ্ঞতা লাভের পর কিছু পাওয়ার বাসনা তাহার মনে দানা বাঁধিয়া উঠে। শিশু অত্যন্ত সংরক্ষণশীল; কোন নূতনত্ব সে পছন্দ করে না। সে যদি কথা বলিতে পারিত, তবে হয়ত বলিতঃ "তুমি কি মনে কর, আমার জীবনকালের অভ্যাস আমি ছাড়িয়া দিব?" যেরূপ ক্ষিপ্রতার সঙ্গে শিশু অভ্যাস আয়ত্ত করে তাহা বিস্ময়কর। প্রত্যেকটি কু-অভ্যাস পরবর্তীকালে সদ্‌ভ্যাসগুলির প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়ায়; এ জন্যই অতিশৈশবে প্রথম অভ্যাস গঠনের গুরুত্ব এত বেশী। প্রথম অভ্যাসগুলি যদি ভাল হয় তবে পরে অশেষ ঝামেলার হাত হইতে রেহাই পাওয়া যায়। অধিকন্তু, শৈশবে কোন অভ্যাস আয়ত্ত হইলে তাহাকে পরে প্রবৃত্তি বলিয়া মনে হয় এবং প্রবৃত্তির মতই ইহা স্থায়ী ও দৃঢ়মূল হইয়া উঠে। পরবর্তীকালে ইহার বিপরীত অভ্যাস গঠিত হইলে তাহা প্রথম-গঠিত অভ্যাসের মত দৃঢ় হয় না। এজন্যও প্রথম অভ্যাস গঠনের উপর খুবই গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

শৈশবে অভ্যাস-গঠনের বিষয় আলোচনা করিবার সময় দুইটি বিষয়ের কথা উঠেঃ প্রথম এবং বিশেষ প্রয়োজনীয় হইল স্বাস্থ্য, দ্বিতীয়, চরিত্র। আমরা চাই শিশু যেন সকলের প্রিয় হয় এবং জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইতে সমর্থ হয়। সৌভাগ্যক্রমে স্বাস্থ্য এবং চরিত্র এ উভয়েরই লক্ষ্য ইহাই; একটির পক্ষে যাহা শুভংকর অন্যটির পক্ষেও তাহা কল্যাণকর। এই পুস্তকে আমরা চরিত্র সম্বন্ধেই বিশেষভাবে বিবেচনা করিব; কিন্তু স্বাস্থ্যের জন্যও অনুরূপ অভ্যাস এবং প্রক্রিয়া দরকার। কাজেই আমাদিগকে স্বাস্থ্যবান শয়তান বা রুগ্ন ঋষির মধ্যে একজনকে বাছিয়া লইবার কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইবে না।

শিশু যখন চিৎকার করে তখনই না খাওয়াইয়া নিয়মিত সময় অন্তর

খাওয়ানর উপকারিতা আজকাল প্রত্যেক শিক্ষিতা মাতাই জানেন। এ রীতি প্রচলিত হইয়াছে এইজন্য যে, ইহা শিশুর হজম ক্রিয়ার পক্ষে উপকারী; এ কারণই নিয়মিত খাবার দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট কিন্তু নৈতিক শিক্ষার পক্ষেও ইহা বাঞ্ছনীয়। বয়স্ক ব্যক্তিরা যতখানি মনে করেন শিশুরা তাহার চেয়ে অনেক বেশী চতুর; যদি তাহারা দেখে যে, চিৎকার করিলেই আরামদায়ক কিছু পাওয়া যায় তবে তাহারা চিৎকার করিবেই। পরবর্তীকালে সবকিছু লইয়াই খুঁত খুঁত করার বা আব্দার করার অভ্যাসের ফলে যখন তাহারা অপরের নিকট অপ্রিয় হয় এবং নিজেদের ঈপ্সিত জিনিস পায় না, তখন তাহারা রুষ্ট ও বিস্মিত হয় জগত তাহাদের নিকট উদাসীন এবং সহানুভূতিহীন বলিয়া মনে হয়। তাহারা যদি রূপসী স্ত্রীলোকে পরিণত হয়, ঘ্যান্‌ঘেনে প্যানপেনে স্বভাবের হইলেও তাহারা আদর পাইবে এবং ইহার ফলে শৈশবে যে কুশিক্ষা পাইয়াছিল তাহাই দৃঢ়তর হইবে। ধনীলোকের বেলাতেও ইহা সত্য। শৈশবে যদি উপযুক্ত শিক্ষা না পায় তবে পরবর্তীকালে তাহারা (নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী) মনোবাসনা পূর্ণ না হওয়ায় হয় অসন্তুষ্ট হইবে, আর না হয় হইবে স্বার্থপর অত্যাচারী। যে মুহূর্তে শিশুর জন্ম হয় তখনি নৈতিক শিক্ষাদান আরম্ভ করার সবচেয়ে উপযুক্ত সময় কেননা তখন তাহার কোন বাসনা গঠিত হয় নাই; কাজেই তখন এ শিক্ষা দিতে গিয়া তাহার কোন বাসনাকে খর্ব করিতেও হইবে না। পরবর্তীকালে এ শিক্ষা দিতে গেলেই কতকগুলি অভ্যাসের বিরুদ্ধে ইহা প্রয়োগ করিতে হইবে এবং স্বভাবতই ইহা শিশুর ক্রোধের উদ্রেক করে।

শিশুর সঙ্গে ব্যবহারে অবহেলা ও আদর এই দুইটির মধ্যে সমতা রাখা দরকার। তাহার স্বাস্থ্যের জন্য যাহা প্রয়োজন তাহা অবশ্যই করিতে হইবে; ঠাণ্ডা বাতাসে থাকিলে তাহাকে তুলিয়া শুকনা গরম জায়গায় রাখিতে হইবে। কিন্তু কাঁদিবার পক্ষে যথেষ্ট কোন দৈহিক কারণ না থাকা সত্ত্বেও যদি সে কাঁদিতে থাকে, তাহাকে কাঁদিতেই দিতে হইবে; তাহা না হইলে অল্পদিনের মধ্যেই সে স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠিবে। তাহাকে পরিচর্যা করিবার সময় অযথা হৈ-চৈ বা অত্যধিক আদর ও প্রীতি দেখাইবার কোন প্রয়োজন নাই। কোন বয়সেই শিশুকে অতিরিক্ত মাত্রায় আদর আপ্যায়ন দেখানো উচিত নয়। প্রথম হইতেই তাহাকে একজন ভাবী বয়স্থ ব্যক্তিরূপে দেখিতে হইবে। বয়স্থ ব্যক্তির মধ্যে যে অভ্যাস অসহনীয় মনে হয়, শিশুর মধ্যেই তাহাই প্রীতিকর বোধ হইতে পারে। অবশ্য শিশু যথার্থ বয়স্ক ব্যক্তির অভ্যাস গঠন করিতে পারে না, তবে এরূপ অভ্যাস গঠনে যাহা যাহা প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করিতে পারে তাহা এড়াইয়া যাওয়াই উচিত। সর্বোপরি কখনই শিশুর মনে আত্ম-প্রাধান্যের ভাব জন্মিতে দেওয়া ঠিক হইবে না, কেননা এই ভাব গড়িয়া উঠিলে পরবর্তী বয়সে সে যখন অন্য সকলের নিকট হইতে বিশেষ আপ্যায়ন পাইবে না, তখন তাহার মনে আঘাত লাগিবে।

শিশুকে শিক্ষা দিবার সময় পিতামাতার পক্ষে সবচেয়ে কঠিন ব্যাপার হইল

আদর ও অনাদরের মধ্যে সূক্ষ্ম সমতা রাখিয়া আচরণ করা। শিশুর যাহাতে কোনপ্রকার স্বাস্থ্যহানি না ঘটে সেজন্য সদাজাগ্রত সতর্কতা এবং যত্ন দরকার। সন্তানের প্রতি মমতা অত্যধিক না হইলে এগুলি প্রায়ই দেখা যায় না। কিন্তু যেখানে এইরূপ সতর্কতা ও যত্ন পরিচর্যা আছে সেখানে হয়ত বিশেষ বিজ্ঞতার সঙ্গে এগুলি প্রয়োগ করা হয় না। স্নেহশীল পিতামাতার কাছে সন্তান একটি মহাসামগ্রী। পিতামাতা যদি সন্তানের প্রতি আচরণে বিশেষ সংযত না হন তবে শিশু ইহা বুঝিতে পারে এবং নিজেকে মহামূল্যবান মনে করিয়া নিজের সম্বন্ধে কাল্পনিক উচ্চ ধারণা গড়িয়া তোলে। পরবর্তীকালে সামাজিক পরিবেশে সে তো পিতামাতার কাছে যেরূপ পাইয়াছে সেরূপ আদর যত্ন পাইবে না, পিতামাতার অহেতুক স্নেহের আতিশয্য তাহার মনে যে ধারণা সৃষ্টি করিয়াছিল যে সে সকলের আদরের মধ্যমণি তাহা অবশেষে তাহাকে নিরাশ করিবে। কাজেই পিতামাতার কর্তব্য হইল শুধু শিশুর প্রথম বৎসর নয়, পরেও সন্তানের কোন অসুখ বিসুখ হইলে উৎকণ্ঠা প্রকাশ না করিয়া স্বাভাবিক-ভাবে প্রফুল্লতার সঙ্গেই তাহা গ্রহণ করা উচিত। আগের দিনে শিশুর অসুখ হইলেই তাহাকে অন্য সকলের কাছ হইতে পৃথক করিয়া, জামাকাপড় দিয়া আষ্টেপিষ্ঠে জড়াইয়া বিছানায় শোওয়াইয়া রাখা হইত, কিংবা কোলে করিয়া অথবা দোলনায় রাখিয়া দোলানো হইত। তাহার স্বতঃস্ফূর্ত আচরণে বাধা পড়িত। সন্তান মানুষ করার এই পন্থা ছিল আগাগোড়া ভুলে ভরা। ইহা শিশুকে অসহায়, পরজীবী আদরে গোপালে পরিণত করিত। যথার্থ নিয়ম হইলঃ শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত কাজে উৎসাহ দিন, কিন্তু অন্যের উপর দাবী করিলে তখন তাহাকে থামান। আপনি শিশুর জন্য কতখানি করেন বা কি পরিমাণ কষ্ট করেন তাহা শিশুকে দেখিতে দিবেন না। যেখানে সম্ভব সেখানে শিশু বয়স্ক ব্যক্তির উপর জুলুম করিয়া নয়, নিজের চেষ্টাতেই সাফল্য লাভ করুক: ইহাতে সে আত্মতৃপ্তি লাভ করিবে। আধুনিক শিক্ষায় আমাদের উদ্দেশ্য হইল—বাহিরের শাসন ও শৃঙ্খলা যথাসম্ভব কমাইয়া দেওয়া। ইহার জন্য ভিতর হইতে আত্মশৃঙ্খলা জাগানো দরকার। এই আত্মশৃঙ্খলা শিশুর প্রথম বছরে আয়ত্ত করানো যেমন সহজ তেমন কোন সময়ে নয়। উদাহরণ দিয়া বলি শিশুকে যখন ঘুম পাড়াইতে চান তখন ইহাকে দোলনায় রাখিয়া দোলান বা কোলে করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইবার দরকার নাই, এমন কি আপনি যেখানে থাকিলে সে শুইয়া থাকিয়া আপনাকে দেখিতে পাইবে এমন জায়গাতেও থাকিবেন না। কিন্তু আপনি যদি সোহাগ দেখাইয়া কোলে করিয়া ঘোরেন কিংবা আরাম-দায়ক দোল দেন, তবে পরে ঘুম পাড়াইতে চাহিলেও আপনাকে আবার ঐরূপ করিতে হইবে এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে বুঝিবেন শিশুকে ঘুম পাড়ানো কি ঝকমারী কাজ। আপনি বরং উহাকে শুকনা জামা পরাইয়া, শুকনা বিছানায় শোওয়াইয়া দিন; তারপর শান্তস্বরে কয়েকটি মন্তব্য করিয়া চলিয়া আসুন। কয়েক মিনিট সে কাঁদিতে পারে কিন্তু যদি কোনরূপ অসুখ না থাকে তবে

সে খানিক পরেই থামিবে। তখন যদি দেখিতে যান, দেখিতে পাইবেন শিশু গভীর ঘুমে মগ্ন রহিয়াছে। কোলে করিয়া ঘোরা বা আদর করিয়া চাপড়ানোর চেয়ে এই প্রক্রিয়ায় শিশু অনেক বেশী ঘুমাইবে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে সদ্যঃপ্রসূত শিশুর কোন অভ্যাস থাকে না, থাকে কেবল কতকগুলি প্রতিবর্তী এবং প্রবৃত্তি। ইহা অনুমান করা যায় যে, তাহার জগৎ কোনরূপ 'বস্তু' দ্বারা গঠিত নয়। কোন জিনিস চিনিতে হইলে বারংবার একই প্রকার অভিজ্ঞতা দরকার; কোন জিনিস সম্বন্ধে ধারণা জন্মিবার পূর্বে তাহা নিশ্চয়ই চিনিতে হইবে। শিশুর কাছে তাহার খাটের স্পর্শ, তাহার মায়ের স্তন বা দুধের বোতলের গন্ধ ও স্পর্শ এবং তাহার মায়ের কিংবা ধাত্রীর কণ্ঠস্বর অল্প সময়ের মধ্যে পরিচিত হইয়া ওঠে। তাহার মায়ের চেহারা বা খাটের আকৃতি সম্বন্ধে ধারণা পরে আসে, কেন না সদ্যোজাত শিশু কোন জিনিস ভাল করিয়া দেখিবার মত চোখের দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে পারে না। ক্রমে সংস্পর্শের ফলে অভ্যাস গঠনের ভিতর দিয়া স্পর্শ, দৃষ্টি, ঘ্রাণ এবং শ্রবণ একত্র মিলিয়া কোন বিষয় সম্বন্ধে শিশুর ধারণা জন্মায় 'অর্থাৎ' স্পর্শ করিয়া, চোখ দিয়া দেখিয়া ঘ্রাণ লইয়া এবং শব্দ শুনিয়া শিশু কোন বস্তু সম্বন্ধে ধারণা গঠন করে; একটি চিনিলে আর একটি চিনিতে আগ্রহ জন্মে। তখনও কিছু সময়ের জন্য শিশুর নিকট কোন পদার্থ বা মানুষের মধ্যে পার্থক্য বোধ জন্মে না। যে শিশু কখনও মায়ের দুধ পান করে, কখনো বা বোতলভরা দুধ পান করে সে কিছুদিন পর্যন্ত তাহার মা এবং বোতলের প্রতি একই রকম ভাব পোষণ করিবে। এই সময়ে কেবল নিছক দৈহিক উপায়েই শিক্ষা দিতে হইবে। এ সময় শিশুর আনন্দ এবং কষ্ট সবই দৈহিক। খাবার পাইলে এবং কোমল উষ্ণতা বোধ করিলে সে আনন্দিত হয়, দেহের ব্যথাতেই কষ্ট পায়। আনন্দের সহিত যাহা সংযুক্ত তাহা পাওয়ার জন্য আচরণের অভ্যাস এবং কষ্টের সঙ্গে যাহা সংযুক্ত তাহা পরিহার করার জন্য আচরণের অভ্যাস এই সময় গড়িয়া উঠে। শিশুর ক্রন্দন আংশিকভাবে প্রতিবর্তী মাত্র, দৈহিক কষ্ট পাইলেই স্বভাবতই সে কাঁদিয়া উঠে; আনন্দ পাওয়ার উপায় হিসাবেও কখনো কখনো শিশু কাঁদিয়া থাকে। প্রথম প্রথম অবশ্য কেবল কষ্ট অনুভব করিয়াই কাঁদে। শিশু যখন কষ্ট বা ব্যথা পাইয়া কাঁদিতে থাকে তখন কষ্টের কারণ দূর করিলেই সে আনন্দ পায়। এইভাবে কাঁদার সঙ্গে আনন্দের অনুভূতির যোগ সাধিত হয়। ইহার পরে শিশু দৈহিক কোনরকম ব্যথা বোধ না করিলেও আনন্দ কামনা করিয়া কাঁদিতে শুরু করে; ইহা তাহার বুদ্ধির জয়ের একটি প্রথম পরিচয়। কিন্তু যতই চেষ্টা করুক, প্রকৃত বেদনা বা কষ্ট বোধ করিলে যেভাবে চিৎকার দেয় সেরূপ চিৎকার কিন্তু তাহার মুখ দিয়া বাহির হয় না। মায়ের কানে এ পার্থক্য ধরা পড়ে এবং তিনি যদি বুদ্ধিমতী হন তবে যে কান্না দৈহিক কষ্টের দ্যোতক নয় তাহা উপেক্ষাই করিবেন। শিশুকে কোলে করিয়া নাচাইয়া কিংবা ইহার কানের কাছে মিষ্টি স্বরে গান করিয়া আনন্দ দেওয়া সহজ এবং শিশুর কাছে

তাহা আরামদায়ক। এরূপ পাইলে শিশু শীঘ্রই আরো বেশী বেশী আরাম দাবী করিবে এবং ইহা না হইলে ঘুমাইবে না; কিন্তু কেবল খাবার সময় ছাড়া সারা দিনমান শিশুর ঘুমাইয়া কাটান উচিত। এ উপদেশ কঠোর মনে হইতে পারে কিন্তু অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যায় যে, ইহা শিশুর স্বাস্থ্য ও আনন্দের কারণই হইয়া থাকে।

বয়স্ক ব্যক্তিরা শিশুদিগকে আদর আহ্লাদ দিতে গিয়া যেন বাড়াবাড়ি না করে সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে; শিশুরা নিজেদের চেষ্টায় যে আনন্দ লাভ করিতে পারে তাহাতে বরং উৎসাহ দিতে হইবে। প্রথম হইতেই যাহাতে ইহারা হাত-পা ছুড়িয়া মাংসপেশীর সঞ্চালন করিতে পারে তাহার সুবিধা করিয়া দিতে হইবে। আমাদের পূর্বপুরুষগণ এতদিন পর্যন্ত কেমন করিয়া শিশুদিগকে গরম কাপড় দিয়া জড়াইয়া রাখিতেন ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। ইহা দেখিয়া মনে হয় সন্তান-স্নেহ আলস্যকে জয় করিতে পারে নাই, কেননা হাত-পা মুক্ত থাকিলে শিশুর প্রতি বেশী সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হয়। যখন শিশু দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে পারে তখন হইতেই সে চলমান জিনিস দেখিতে আনন্দ পায়, বিশেষ করিয়া হাওয়ায় কোন কিছু দুলিতে দেখিলে। কিন্তু যতদিন না শিশু যাহা দেখে তাহা ধরিতে পারে ততদিন ইহার আনন্দদানের জিনিস খুব বেশী থাকে না। তারপর অকস্মাৎ একটি নূতন আনন্দের সন্ধান পায়—ইহা হইল কোন জিনিস ধরিবার আনন্দ। কিছুদিন শিশু জাগ্রত অবস্থার অনেকটা সময় কিছু ধরিয়া বা ধরিবার চেষ্টা করার আনন্দে অতিবাহিত করে। এই সময়ে সে ঝুমঝুমি হইতে আনন্দ পায়। ইহার কিছু আগে সে হাত পায়ের আঙুল জয় করিয়াছে। প্রথমে শিশুর পায়ের আঙুলগুলির যে সঞ্চালন তাহা সম্পূর্ণ প্রতিবর্তী, অর্থাৎ শিশু নিজে ইচ্ছা করিয়া চালায় না, আপনা-আপনি সঞ্চালিত হয়; পরে সে বুঝিতে পারে যে, ইহার সঞ্চালন তাহার আয়ত্তে। একজন সাম্রাজ্যবাদী কোন বিদেশ জয় করিলে যেরূপ আনন্দিত হন, হাত পায়ের উপর অধিকার লাভ করিয়া শিশুও সেইরূপ আনন্দ অনুভব করে। এগুলি তখন তাহার কাছে আর বাহিরের অঙ্গ নয়। তাহার নিজের অধিকারে; নিজ-দেহেরই অংশ। শিশুর পক্ষে উপযুক্ত জিনিস তাহার হাতের কাছে থাকিলে এই সময় হইতে সে অনেক প্রকারে আনন্দ লাভ করিতে পারে। এই ধরণের আনন্দ শিশুর শিক্ষার পক্ষে উপযোগী, অবশ্য দেখিতে হইবে সে যেন উল্টাইয়া না পড়ে, পিন গিলিয়া না ফেলে কিংবা অন্য প্রকারে আঘাত না পায়।

কেবল খাইবার সময় যে আনন্দ পায় তাহা ছাড়া শিশুর প্রথম তিন মাস মোটের উপর বড়ই নিরানন্দময়। আরাম বোধ করিলেই সে ঘুমাইবে। জাগিলেই কিছুটা অস্বস্তি। মনের শক্তির উপর মানুষের সুখ নির্ভর করে কিন্তু তিন মাসের কম বয়সের শিশুর মধ্যে ইহা দেখা দেয় না; তখন তাহার অভিজ্ঞতা হয় নাই, পেশীও ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে না। ইতর প্রাণীর বাচ্চাগুলি অল্প বয়স হইতেই জীবন উপভোগ করিতে শুরু করে কারণ

তাহাদের অধিকাংশ আচরণই প্রকৃতি কর্তৃক চালিত; অভিজ্ঞতার বিশেষ প্রয়োজন হয় না। কিন্তু মানবশিশু প্রবৃত্তি চালিত হইয়া আনন্দদায়ক কাজ খুব কমই করিতে পারে। মোটের উপর শিশুর প্রথম তিন মাস কালকে অবসাদের কাল বলা যায়; কিন্তু অধিক সময় ঘুমাইবার জন্য এরূপ অবসাদেরই প্রয়োজন। শিশুকে বেশী আমোদ আহ্লাদ দিতে গেলে তাহার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটিবারই সম্ভাবনা।

শিশুর বয়স যখন দুই হইতে তিন মাস তখন সে হাসিতে শেখে এবং মানুষ ও জড়পদার্থের মধ্যে পার্থক্য বুঝিতে পারে। এই সময় হইতে মায়ের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিতে থাকে; মাকে দেখিলে সে আনন্দ প্রকাশ করে এবং সাড়া দেয়। অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাহার মনে প্রশংসা ও অনুমোদন পাওয়ার বাসনা জাগিয়া উঠে। আমার নিজের ছেলের বয়স যখন পাঁচ মাস তখন এ বাসনার স্পষ্ট প্রকাশ দেখা গিয়াছে, কয়েকবার চেষ্টার পর সে টেবিলের উপর হইতে একটা ভারী ঘণ্টা তুলিয়া লইল এবং বাজাইবার সময় গর্বের হাসি হাসিয়া সকলের মুখের দিকে তাকাইতে লাগিল। এই সময় হইতে শিক্ষকের হাতে একটি নূতন অস্ত্র আসিল—ইহা হইল প্রশংসা ও নিন্দা। শৈশবে এই অস্ত্রের শক্তি খুব বেশী কিন্তু বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে ইহা প্রয়োগ করিতে হইবে। শিশুর প্রথম বছরে তাহাকে কখনই নিন্দা করা ঠিক হইবে না পরেও ইহা খুব কম প্রয়োগ করিতে হইবে। প্রশংসা বরং কম ক্ষতিকর। কিন্তু ইহা অতি অল্পতেই যখন তখন প্রয়োগ করিলে ইহার মূল্য কমিয়া যায়। শিশুকে অতিরিক্ত মাত্রায় উৎসাহিত করার জন্যও ইহা প্রয়োগ করা উচিত নয়। শিশু যখন প্রথম হাঁটে এবং বোধগম্য কথা বলে তখন খুব কম পিতামাতাই প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন। তাহা ছাড়া শিশু যখন চেষ্টা করিয়া কোন কঠিন বিষয়ে কৃতকার্য হয় তখন পুরস্কার হিসাবে প্রশংসা তাহার সত্যই প্রাপ্য। অধিকন্তু শিশুকে ইহা বুঝিতে দেওয়া ভাল যে, আপনি তাহার শিক্ষার বাসনার সহানুভূতি দেখাইতেছেন।

শিশুর শিখিবার বাসনা এত বেশী যে, পিতামাতা কেবল ইহার সুযোগ করিয়া দিলেই যথেষ্ট। শিশুকে আত্মবিকাশের সুযোগ দিন, সে নিজের চেষ্টাতেই অগ্রসর হইবে। শিশুকে হামাগুড়ি দিতে, হাঁটিতে অথবা তাহার পেশী নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত অন্য কোন কিছু শিখাইতে হইবে না। আমরা অবশ্য কথা বলানো শিখাই কিন্তু ইহাতে কোন উপকার হয় কিনা সন্দেহ। শিশুরা নিজেদের বুদ্ধির সঙ্গে সমতা রাখিয়া শিখিতে থাকে, জোর করিয়া শিখানোর চেষ্টা করা ভুল। চেষ্টা করিয়া প্রাথমিক অসুবিধাগুলি জয় করিয়া কৃতকার্য হওয়ার যে অভিজ্ঞতা তাহাই সারাজীবন ধরিয়া চেষ্টার প্রেরণা যোগায়। এই অসুবিধাগুলি এমন হওয়া উচিত নয় যাহা শিশু জয় করিতে না পারিয়া নিরুৎসাহ হইয়া পড়ে কিংবা এমন সহজও হওয়া উচিত নয় যাহাতে কোন চেষ্টারই প্রয়োজন হয় না। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত ইহাই হইল মৌলিক

ীতি। আমরা নিজেরা যাহাকিছু করি কেবল তাহা দ্বারাই শিখিয়া থাকি। য়স্ক ব্যক্তি এইটুকু করিতে পারেন—শিশু যাহা করিতে চাহিবে এমন কিছু নজে করিয়া দেখাইলেন যেমন ঝুমঝুমি বাজানো; তারপর কেমন করিয়া ঝুম-ুমি বাজাইতে হয় শিশু নিজে চেষ্টা করিয়া শিখুক। অন্যে যাহা করে তাহা দখিয়া সে সেইরূপ চেষ্টা করিতে উৎসাহী হয় মাত্র; অন্যের কিছু করা তাই শশুর শিক্ষা নয়, শিক্ষার প্রেরণা মাত্র।

নিয়মানুবর্তিতা এবং রুটিন মত কাজ শিশুর জীবনে বিশেষ করিয়া প্রথম ছরে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। প্রথম হইতে ঘুম, খাওয়া এবং মলমূত্র ত্যাগে নর্দিষ্ট অভ্যাস গঠন করাইতে হইবে। ইহাছাড়া পরিবেশের সঙ্গে পরিচিতি শশুর মনের দিক দিয়া বিশেষ উপকারী। ইহা তাহাকে জিনিস চিনিতে াহায্য করে এবং তাহার মনে নিরাপত্তার ভাব গড়িয়া তোলে। আমার অনেক ময় মনে হইয়াছে যে, প্রকৃতির নিয়ম সর্বদা একইরকম থাকে বলিয়া যে জ্ঞানিক বিশ্বাস আমাদের মধ্যে গড়িয়া উঠিয়াছে নিরাপত্তার বাসনা হইতেই হার উৎপত্তি। যাহা ঘটিবে বলিয়া জানা আছে তাহার সঙ্গে আমরা আঁটিয়া ঠিতে পারি কিন্তু প্রকৃতির নিয়ম যদি অকস্মাৎ পরিবর্তিত হইয়া যাইত তবে ামরা বাঁচিতাম না। প্রথম অবস্থায় শিশু থাকে দুর্বল, তাহাকে আশ্বস্ত রিবার এবং সকল আপদ হইতে রক্ষা করিয়া আরামে রাখিবার প্রয়োজন াছে। শৈশবাবস্থার শেষ দিকে শিশুর নূতনের প্রতি ঝোঁক বাড়ে কিন্তু থম বছরে অস্বাভাবিক জিনিস মাত্রই তাহার ভীতি উৎপাদন করে। যদি ারেন, শিশুকে ভয় অনুভব করতে দিবেন না। যদি সে অসুস্থ হয় এবং াপনি উদ্বিগ্ন হন, আপনার উদ্বেগ সযত্নে গোপন রাখিবেন যাহাতে শিশু মাটেই বুঝিতে না পারে। এমন কিছুই করিবেন না যাহা উত্তেজনা সৃষ্টি রিতে পারে। শিশু যদি না খায়, না ঘুমায়, কিছুক্ষণ মলমূত্র ত্যাগ না করে বে উদ্বেগের ভাব দেখাইবেন না। কেননা এরূপ করিলে শিশুর মনে আত্ম-াধান্যের ভাব উঠিতে পারে। ইহা কেবল শিশুর প্রথম বছরেই প্রযোজ্য নয়, াবেও মানিয়া চলা উচিত। শিশুকে কখনই বুঝিতে দিবেন না যে, আপনি ান শিশু কোন একটি স্বাভাবিক কাজ করুক যাহা তাহার নিজের পক্ষেও ানন্দদায়ক, যেমন খাওয়া, এবং তাহা করিয়া সে আপনাকে আনন্দ দিক। রূপ করিলে সে বুঝিবে যে একটি নূতন ক্ষমতা সে হাতে পাইয়াছে; এবং াহা সে আপনা আপনিই করিত তাহা করাইবার জন্য তাহাকে অন্যে আদর আপ্যায়ন তোষামোদ করুক ইহাই সে মনে মনে কামনা করিবে। অনুমান করিবেন না যে, শিশুর এইরূপ আচরণ বুঝিবার মত বুদ্ধি নাই। ইহার ক্ষমতা কম, বুদ্ধিও সীমাবদ্ধ কিন্তু যেখানে সে ইহা প্রয়োগ করিতে পারে সেখানে তাহার বুদ্ধি বয়স্থ ব্যক্তির মতই। প্রথম বারো মাসের মধ্যে শিশু যতখানি শেখ পরবর্তীকালে ঐ পরিমাণ সময়ের মধ্যে সে আর ততখানি শিখিতে পারে না, অত্যন্ত সক্রিয় বুদ্ধি না থাকিলে কখনই ইহা সম্ভব হইত না।

আসল কথা হইল ঃ শিশুর মধ্যে ভবিষ্যতের একজন বয়স্কব্যক্তির সম্ভাবনা নিহিত রহিয়াছে ইহা মনে করিয়া ছোট্ট শিশুর প্রতিও শ্রদ্ধাযুক্ত আচরণ করুন। আপনার বর্তমান সুবিধার নিকট কিংবা শিশুকে অত্যধিক আদর করিয়া যে আনন্দ পান তাহার নিকট শিশুর ভবিষ্যৎ বলি দিবেন না। এ দুইটিই সমান ক্ষতিকর। অন্যত্র যেমন এখানেও তেমনি শিশুর শিক্ষাদান ব্যাপারে ঠিক পথে চলিতে হইলে স্নেহ ও জ্ঞানের মিলন আবশ্যক।